চালচিত্রের ইতিকথা

মা আসছেন। মা দুর্গা আর চালচিত্র এক অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা। সেই পরম্পরা অবশ্য থিম পুজোর দৌলতে ভুলতে বসেছি প্রায় সবাই। সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে সেই চালচিত্র নিয়েই উঠে এল বেশ কিছু চিত্রকথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী*-তে আছে ব্রজেশ্বর দেবী চৌধুরাণীর কামরায় ঢুকে দেখলেন কামরার কাঠের দেওয়ালে বিচিত্র চারুচিত্র। এ যেন দশভূজার চালা। 'শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, মহিষাসুরের যুদ্ধ, দশাবতার, অষ্টনায়িকা, সপ্তমাতৃকা, দশমহাবিদ্যা, কৈলাশ, বৃন্দাবন, লঙ্কা, ইন্দ্রালয়, নরনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ সকলই চিত্রিত।' বাংলায় মাটির মূর্তি গড়ে দুর্গাপুজার চল কবে থেকে শুরু হল তা নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। তবে এটা ঠিক যে প্রথম থেকেই দুর্গার উপরে চালচিত্র ছিল। চাল মানে আচ্ছাদন। বাংলায় দু-তিনশো বছরের পুরোনো যে ছবি আমরা দেখতে পাই তাতে চিত্রিত একটি পশ্চাৎপটের কেন্দ্রে রয়েছেন সিংহবাহিনী দেবী – তিনি অসুরকে বধ করছেন ত্রিশূল দিয়ে বিদ্ধ করে। তাঁর ডানপাশে লক্ষ্মী-গণেশ, বাঁ পাশে সরস্বতী-কার্তিক। চিত্রিত পৃষ্ঠপট বা চালচিত্রে স্থাপিত এই মূর্তি একচালা নামে পরিচিত। এই ধরণের মূর্তি এখনও প্রত্নবস্তু হয়ে যায়নি। মোটামুটি উচ্চবিত্ত কিছু পরিবারে এখনও দুর্গাপুজা হয়। মূর্তিটি অবশ্যই একচালা, তবে 'ডাকের সাজ' প্রতিমার মত দেবী সেখানে অতটা রত্নবিভূষিতা নন। দেবীর গাত্রবর্ণে হাল্কা কমলা রঙের আভাস দেখা যায়। হাতের তালু রক্তবর্ণ। অসুরের গায়ের রং সাধারণত হয় গাঢ় সবুজ। পুরোনো দিনের একচালা প্রতিমায় দেবদেবীর মাথার ওপরে একটা যে চাল রাখা হতো তা পূর্ব-ভারতীয় ভাস্কর্যের একটা বৈশিষ্ট্য। শুধু দেবদেবী নয়, পশুদের মূর্তিতেও একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি চাল থাকতো। যখন মাটির প্রতিমা গড়া শুরু হল তখন পশুদের মাথার ওপরের অর্ধবৃত্তটি চালে রূপান্তরিত হল। চাল তো ফাঁকা রাখা যায় না, তাই সেটা ভরাতে গিয়ে প্রথম দিকে হয়তো ফুল-লতা-পাতা আঁকা হতো ঐ চালের ভিতরে। অতঃপর চালচিত্রের মধ্যে আঁকা হতে লাগলো নানারকমের দেবদেবী, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দশাবতার ইত্যাদি। গত দশ পনেরো বছর ধরে এই যে থিম পুজার এত রমরমা – এই থিমের চিন্তার সূত্রপাত মনে হয় ঐ চালচিত্র ঘিরে।

প্রথমে দুর্গাপূজা হতো রাজবাড়ী, জমিদার বাড়ি কিংবা ধনীর গৃহে ধূমধাম করে। এই পুজায় সর্বাসাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকায় এক শ্রেণীর উদ্যোগী পুরুষ দুর্গাপুজার মতো ব্যয়বহুল একটি পুজা প্রবর্তনের কথা চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। বারোজন ইয়ার বা বন্ধুর মাথায় দুর্গাপুজার আইডিয়াটা সর্বপ্রথম এলো। সেজন্য পাড়ার প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ অনুদান হিসাবে নিয়ে সূচনা হল বারোয়ারি পুজার। এইভাবে ধনীগৃহের পারিবারিক পুজার রন্ধ্রপথে বারোয়ারি পুজার প্রবেশ। জমিদার বাড়ির দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রে পৌরাণিক চিত্র ছাড়াও সামাজিক কিছু কিছু ছবিও থাকতো কিন্তু দুর্গাপ্রতিমা জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে বারোয়ারি পুজার রমরমার পরে সামাজিক প্রক্ষেপ আরো বেশি করে দেখা গেল। বারোয়ারি পুজায় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারায় পুজামণ্ডপ হয়ে উঠলো সবার পরশে পবিত্র করা এক তীর্থক্ষেত্র। শুরু হল দুর্গাপুজার ইতিহাসে পালাবদলের আর এক অধ্যায়। দুর্গামূর্তি এবং দুর্গা পরিবারের মধ্যে একটা মুক্ত হাওয়া ঢুকে পড়লো। অর্থাৎ পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় বিধান যেন কিছুটা আলগা হয়ে গেল। আশির দশকে বারোয়ারি প্যাণ্ডেলগুলিতে একচালা নয়, বিচ্ছিন্ন পরিবারকেই দেখা যায়। একটা সময় কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী চালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা খোপ। বারোয়ারি পুজার জাঁকজমক যেমন বাড়ির পুজাকে ম্লান করে দিয়েছে তেমনি আলাদা আলাদা মূর্তিপুজার চলন এসে যাওয়ায় চালচিত্রের সংখ্যাও শোচনীয়ভাবে কমে গিয়েছে। আসলে চালচিত্রতো জড়ানো পট বা কালিঘাটের পটের মত স্থায়ীভাবে রাখার কথা ভাবা যায় না। চালচিত্রের আয়ুষ্কাল নিতান্তই পুজার চারদিন। ঠাকুর দশমীতে বিসর্জনের সময় জলে ভাসলেন কি, দেবী চালে আঁকা শিল্পকলার ঘটে গেল সলিল সমাধি।

সুধীর চক্রবর্তীর *চালচিত্রের চিত্রলেখা* বইটিতে যে বিভিন্ন রকমের চালের বর্ণনা আছে তাতে 'বাংলা চালে' দেবদেবীর ছবিই বেশি পাওয়া যায়। তবে সব চালচিত্রই যে অর্ধবৃত্তাকার হত তা নয়। মোট তিনরকমের চালচিত্রের ধাঁচা হতো, এখনও হয়। একরকম হল সাবেক রীতির – যা সচরাচর আমরা দেখে থাকি। আরেকরকম হল চালারীতির – দুদিকে মূর্তি ছাড়িয়ে নেমে যায়। আর তৃতীয় রকম কাঠামো হল রথের মত তিনচূড়ো। গড়পড়তা হিসাবে ঠাকুর যাঁরা গড়েন তাঁরাই চালচিত্র আঁকেন। অর্থাৎ কুমোরেরা। সাধারণত কুমোরেরা অন্য জায়গা থেকে পট কিনে এনে চালচিত্রে সেঁটে দেন। সে পট পাওয়া যায় সাজের দোকানে, কুমোরটুলিতে কিংবা দশকর্মা ভাণ্ডারে। তবে এও সত্যি যে, দোকানে যে সব চালচিত্র পট কিনতে পাওয়া যায় তা কুমোরদেরই তৈরি। বর্ষার সময় যখন কুমোরদের হাতে ঠাকুর গড়ার তেমন কাজ থাকে না তখন এক শ্রেণীর কুমোর তাঁদের বউ কিংবা মেয়ের সহায়তা নিয়ে পট এঁকে পাইকারদের বেচে দেন। আসলে চালচিত্রের পোটোদের যেমন সেরকম সামাজিক মর্যাদা, সম্ভ্রম বা অর্থকৌলীণ্য নেই, তেমনি এই শিল্পরীতির মূল ভিতের

মধ্যেই একটা বিনাশের লক্ষণ রয়ে গেছে। পটচিত্রকরদের এঁকে তেমন টাকা জোটে না, শিল্পী বলেও যশ মেলে না। শিল্পপ্রতিভার নমুনাটুকুও টেঁকে না – তাহলে কীসে উৎসাহ পাবেন তাঁরা?

বেশীরভাগ পটচিত্রকর আজ প্রধাণত ঠাকুরই গড়েন কারন চালচিত্র এঁকে পোষায় না। কেন পোষায় না তা তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে – চালচিত্রের চিত্রকলা সম্পর্কে আমরা যে এতটা উদাসীন ও অচেতন তার কারন অনেক সময় চালচিত্রের ছবিগুলি ভালো করে দেখাই যায় না। দেবীমূর্তির সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার আড়ালে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর কাজ করা মুকুটের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে চালচিত্রের যেটুকু নক্সা আমাদের চোখে পড়ে তাতে পটুয়াদের কারুকার্য করা শিল্পকলার বর্ণবিন্যাস ঢাকা পড়ে যায়। এছাড়াও রাত্রে দেবীমূর্তির মুখের উপর যে তীব্র আলোকচ্ছটা নিক্ষেপ করা হয় তাতে মূর্তির পিছনে অন্ধকার ছায়া পড়ে বলে আমরা চালচিত্রের ছবিগুলির প্রকৃত মর্মার্থ উদ্ঘাটন করতে পারিনা। এর ফলশ্রুতিতে চালচিত্রের চিত্রমহিমা অনেকটাই বিঘ্নিত হয় বলে পট নির্মাতার শিল্পিতা কমেছে, বেড়েছে অমনোযোগের শিথিলতা। অথচ একটা সময় – এক যুগে চালচিত্রের পট লেখার জাঁকজমক ছিল খুব।

কালক্রমে বাংলার নানা জনপদে বিষ্ণুপুরী বা কংসনারায়ণী রীতিতে বিগ্রহ রচনার প্রচলন হয়। এই দুই রীতিতেই চালচিত্র পট রচিত হতো। তবে সবচাইতে জমজমাট পটের ব্যবহারে প্রখ্যাত ছিল কলকাতার নানা বনেদী বাড়ির পুজো। এছাড়া হুগলী-হাওড়া-বর্ধমান-নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর আগের মতই এখনও চালচিত্র-পটে সমৃদ্ধ। এর কারন এই সমস্ত জেলায় পটুয়াসমাজ বরাবরই সক্রিয়। যাঁরাই কারুশিল্পী তাঁরাই সূত্রধর পদবী ব্যবহার করতেন এবং এই অঞ্চলে তাঁরা অর্থাৎ ভ্রাম্যমান সূত্রধর সম্প্রদায় কয়েক শতাব্দী ধরে সজীব।

ভারতবর্ষে পট আঁকার ইতিহাস খুব পুরোনো। এখন প্রশ্ন ওঠে যে চালচিত্রে এমন চিত্রকরণের কাজ তা কতদিন থেকে চলছে? মুর্শিদাবাদ জেলার ভট্টবাটি বা ভট্টমাটি গ্রামের একটা টেরাকোটা মন্দিরের চালচিত্র সমন্বিত রিলিফ দুর্গামূর্তি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রাঢ়বঙ্গে চালচিত্র অঙ্কণের রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল অন্ততঃ দুশো বছরেরও আগে। বাংলার চালচিত্র পটের প্রস্তাবনা যদিও ঘটেছিল দুর্গামূর্তিকে রূপান্তর করতে তথাপি পরবর্তীকালে তা প্রভাবিত করেছে নান্দনিক আরো নানারকম কলাকুশলতাকে। আমাদের শাস্ত্রছুট্ মনের কত লোকায়ত সৃজনশীলতা যে পথ করে নিয়েছে দেবীচালের অলংকৃত অর্ধবৃত্তে। প্রতিমা নির্মাণ শৈলীতেও শিল্পসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাবেকি একচালা প্রতিমা আবার

ফিরে এসেছে। প্রাচীন প্রতিমার আদলে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মহিষমর্দিনী মূর্তি। প্রাচীন পরম্পরাকে মর্যাদা দিয়েই উদ্ভাবন করা হচ্ছে নতুন নতুন শিল্পরীতি। শাস্ত্রের অনুশাসনকে গৌণ করে শেষ পর্যন্ত বড়ো হয়ে উঠেছে শিল্পচর্চাই। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের চিরন্তন আকর্ষণ রয়ে গেছে বলেই শিকড়ের কাছে সে বারেবারে ফিরে যেতে চায়। লোকজ সম্ভার আমাদের এই স্মৃতিগুলিকে উসকে দেয়, তাই চালচিত্রের পটে গাঁথা হয় অলৌকিকের কিছু লোকায়ত ভাষ্য।

এখনও দেবীচালের সমৃদ্ধ অতীতকে পেতে হলে যেতে হবে ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় সংগ্রহশালায়। সেখানে রয়েছে পনেরো হাত সুদীর্ঘ এক দেবীচাল। কালো জমির উপর হলুদ-লাল, সবুজ-নীলে আঁকা অজস্র চিত্র। অর্ধবৃত্তাকার পটের উপর অসংখ্য দৃশ্য ও চরিত্রগুলি বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গিমায় আনুভূমিক পদ্ধতিতে সাজানো। ঘটনার পর ঘটনাগুলি পরপর গায়ে গায়ে আঁকা – কোন বিভাজনরেখা নেই, তবু প্রতিটি বস্তুর আলাদা আলাদা ধরণ স্পষ্ট। গঠনগত কাঠামোর যেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি, তেমনি রং লাগানোতেও রয়েছে সমতলীয় গুণধর্মিতা।

রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্ম নেওয়া ধর্মীয় উৎসব আভিজাত্যের গৃহস্থ গণ্ডি ছেড়ে সর্বজনের হয়েছে উনবিংশ শতকে। এই সর্বজনীনতা বিশ শতকের আধুনিকতায় স্নাত হয়ে ব্যাপকতা লাভ করে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে আধুনিকোত্তর এক সমাজে। বাঙালির দুর্গাপুজাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক বিরাট সাংস্কৃতিক বাণিজ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দুর্গা – সম্পাদনা : লীনা চাকী – দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

চিত্র পরিচিতি : ১। চালচিত্র; ২। চারিচাপাড়ার ভদ্রকালী মূর্তির পিছনে চালচিত্র (ছবি সৌজন্য : সুধীর চক্রবর্তী রচনাবলী, খণ্ড:১, লালমাটি প্রকাশন)।